সেমিওলজি ও ঈশ্বর
শিশির ভট্টাচার্য্য

১. বস্তু ও তার চিহ্ন

মানুষের চারপাশের বস্তুময় জগৎ আর মস্তিস্কের জগৎ পুরোপুরি আলাদা। মানব মস্তিস্কে বস্তু নেই, আছে বস্তুর এক রকম ছবি বা মূর্তি। আপনি দেখছেন বা শুনছেন : 'খোকা কলা খাছে'। ব্যক্তি খোকা বস্তু কলাটা কামড়ে কামড়ে মুখে নিছে। গব গব গ্লুট। কলাটা ধীরে ধীরে চলে গেল খোকার পেটে। খোসাটা পড়ে রইল খোকার হাতে। আপনার চোখের সামনে কদলিভক্ষণের এই কান্ডটি যখন ঘটতে থাকে তখন আপনার মস্তিস্ক কেমন করে তা বোঝে? আপনার মস্তিস্কেতো খোকাও নেই, কলাও নেই। তারা আছে বাস্তবে। আপনার মস্তিস্কে সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তি 'খোকা', বস্তু 'কলা' ও ক্রিয়া 'খাওয়া'র তিন তিনটি আলাদা আলাদা ছবি বা মূর্তি। আপনার চোখের সামনে বাস্তবের খোকা যখন কলা খাওয়া শেষ করছে তখন আপনার মস্তিস্কে খোকার মূর্তির পেটে চলে যাছে কলার মূর্তি। খোকার মুর্তির হাতে ঝুলে আছে খোসার মূর্তি।

অদ্ভুত লাগছে শুনতে তাইতো? সিনেমা বা টেলিভিশনে যখন কাউকে কলা খেতে দেখেন তখন আপনার সামনে আসলেই কেউ কলা খায় না। কলা খাওয়ার ছবিটা শুধু দৃশ্যমান হয় রূপালী পর্দায়। তবে রূপালী পর্দার ছবি বা বাস্তবের কোন মূর্তির সাথে মস্তিস্কে সৃষ্টি হওয়া নিওরোলজিক্যাল ছবি বা মুর্তির তফাৎ আছে। পর্দার শাবনূর বাস্তবের শাবনূরের অবিকল প্রতিরূপ। কোন শিল্পী যদি খোকার একটি মূর্তি নির্মাণ করেন পাথর, মাটি বা প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে তবে তা হবে বাস্তবের খোকার কমবেশী ফিগারেটিভ প্রতিরূপ। মস্তিস্কের মূর্তি কিন্তু তা নয়। এই মূর্তিটি খোকার অবিকল দূরে থাক আদৌ কোন প্রতিরূপ কিনা তাও আমরা জানি না। যা জানি তা হছে এই : খোকার একটি প্রতিরূপ তৈরী হছে আমাদের মস্তিস্কে এবং এই প্রতিরূপটির সাথে একমাত্র খোকারই গভীরতম সম্পর্ক আছে। প্রতিরূপটি যে খোকারই এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তার সাথে বাস্তবের খোকার সাদৃশ্য কতটুকু সেটাই ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয়।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। কমপিউটারের পর্দায় আপনি দেখছেন একটি অক্ষর : 'ক'। কম্পিউটারের স্মৃতিতে 'ক' হছে বিদুৎকণার বিশেষ সংখ্যক উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সমষ্টি। একই ভাবে 'প' বিদুৎকণার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির অন্য একটি সমষ্টি। পর্দার 'ক' একটি মূর্তি। কিন্তু পর্দার পিছনের 'ক' একদিক থেকে চিন্তা করলে মূর্তি, আবার অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে মূর্তি নয়। মস্তিস্কের মূর্তি কমপিউটারের 'ক' এর মতো করে সৃষ্টি হয় কিনা আমরা এখনও তা জানি না। অন্ততপক্ষে মূর্তি বলতে আমরা বাস্তবে যা বুঝি তার সাথে মস্তিস্কে সৃষ্টি হওয়া মূর্তির তফাৎ আছে - এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

যে কলা কিলোদরে বা ডজন হিসেবে দোকানে বা বাজারে বিক্রি হয় সেটি হছে কলা'র 'নির্দেশিত' বা referent। দোকানের তাকে এই রেফারেন্ট বা নির্দেশিত দেখে আপনার মস্তিস্কে একটি ছবি ভেসে উঠে। এই ছবিটির পোষাকী নাম 'দ্যোতিত' বা signified। মানুষের মস্তিস্ক বলে কোন কথা নয়, যে কোন ধরণের মস্তিস্কেই দ্যোতিত সৃষ্টি হতে পারে। একটা কুকুরের সামনেও যদি আপনি মাংস ছুঁড়ে দেন তবে সে তা তৎক্ষণাৎ চিনতে পারবে এবং খাওয়া শুরু করবে। একই কুকুরকে আপনি একটি কলা দিয়ে

দেখুন, সে ছুঁয়েও দেখবে না। এর মানে হচ্ছে এই যে কুকুরের মস্তিস্কেও নির্দেশিত দেখে দ্যোতিত সৃষ্টি হয়।

২. প্রতিমা, প্রতীক ও সঙ্কেত

মানুষের 'মাংস' বা 'কলা' দেখার দরকার নেই। 'মাংস', 'কলা'... ইত্যদি শব্দ শুনলে বা এই কথাদু'টি কোথাও লেখা দেখলেই মানব মস্তিস্কে দ্যোতিতের সৃষ্টি হয়। 'কলা' শব্দটার মধ্যে কি আছে? আছে কতগুলো ধ্বনি। 'ক', 'অ', 'ল' আর 'আ' - এই চার রকমের চারটা ধ্বনি। ধ্বনি চারটি বিশেষ একটি ক্রমে সাজানো থাকলেই শুধু 'কলা'র বোধ জন্মাবে মস্তিস্কে, অন্যথায় নয়। ধ্বনি চারটিকে একটু ওলট পালট করে যদি বলেন 'লকা' তবে কিন্তু কোন দ্যোতিতই সৃষ্টি হবে না মস্তিস্কে। 'লকা' বললে কোন বাঙালীই কিছু বুঝবে না। এই যে এক বা একাধিক ধ্বনি বিশেষ ক্রমে সাজিয়ে নূতন একটি ধ্বনিবস্তু তৈরী হলো এর নাম 'দ্যোতক' বা signifier। 'দ্যোতক' তৈরী হতে পারে ধ্বনি দিয়ে, বর্ণ দিয়ে এমনকি আঁকাও যেতে পারে দ্যোতককে। উচারিত 'কলা' ধ্বনিদ্যোতক, লিখিত 'কলা' লিপিদ্যোতক আর কলার ফটোগ্রাফ বা আঁকা ছবি হবে প্রতিমাদ্যোতক।

মস্তিস্কে সৃষ্টি হওয়া দ্যোতিত ছবি বা মূর্তি কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও দ্যোতক যে একটি মূর্তি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 'কলার ছবি' আর 'কলা' এক কথা নয়। কলা খাওয়া যায়, কলার ছবিতে পেট ভরে না। কানের কাছে হাজার বার 'কলা' শব্দটা শুনলেও কলার স্বাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং কলার ধ্বনিগত ছবি, আঁকা ছবি বা আলোকচিত্র তিন ধরণের তিনটি আলাদা আলাদা মূর্তি। ধ্বনিগত ছবির সাথে আঁকা ছবি বা আলোকচিত্রের পার্থক্য আছে। কলার আঁকা ছবি বা আলোকচিত্র কলার অবিকল প্রতিরূপ। যদি কোন মূর্তি বা ছবির সাথে দ্যোতিতের অবিকল সাদৃশ্য থাকে তবে সে মূর্তিটিকে বলা হবে 'প্রতিমা' বা icon। 'প্রতিমা' হচ্ছে বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ। কলার প্রতিমা দেখে দুনিয়ার সব মানুষই তাকে 'কলা' বলে চিনতে পারবে তা যে ভাষাভাষীই সে হোক না কেন বা যে দেশেই সে থাকুক না কেন।

'কলা'র প্রতিমার সাথে 'কলা'র ধ্বনিমূর্তির একটি পার্থক্য আছে। 'কলা'- এই ধ্বনিসমষ্টির সাথে 'কলা' নামক ফলটির কোন প্রকার সম্পর্ক প্রমাণ করা যাবে না। সম্পর্ক নেই তার প্রমাণ একই 'কলা'র ধ্বনিমূর্তি হাজার ভাষায় হাজার রকম। কোন ভাষায় 'কলা', কোন ভাষায় 'বানান', কোন ভাষায় 'কদলি'। এসব ধ্বনিমূর্তির সাথে 'কলা' ফলটির সম্পর্ক নেই, আবার সম্পর্ক আছেও। সম্পর্ক যদি না থাকতো তবে 'কলা' শব্দটা শুনলে বাংলাভাষীর মস্তিস্কে 'কলা'র বোধ জন্মাত না। কিভাবে এ সম্পর্কের সৃষ্টি তা আমরা জানি না তবে এটকু জানি যে এ সম্পর্ক কাকতালীয়, আপতিক বা আর্বিট্রারী (যার বাংলা তদ্ভব প্রতিশব্দ হতে পারে 'আর্বিত্রিক')। দ্যোতক আর দ্যোতিতের সম্পর্কটি যদি আর্বিত্রিক হয় তবে সেই সম্পর্কের ফলে সৃষ্টি হবে একটি sign বা 'সঙ্কেত'। একে 'চিহ্ন' বলা যেতে পারতো কিন্তু আমরা তা বলবো না, কারণ 'চিহ্ন' শব্দটিকে আমরা ব্যপকতর অর্থে ব্যবহার করবো। ধ্বনিমূর্তি, লিপিমূর্তি, প্রতিমা... সবই বিভিন্ন ধরণের 'চিহ্ন'।

একজন বাঙালী যখন উচারণ করে 'কলা' তখন সে একটি ধ্বনিদ্যোতক সৃষ্টি করে। কিন্তু এই দ্যোতক ফরাসীভাষীর মস্তিস্কে কোন দ্যোতিতই সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং 'কলা' শুনে কোন ফরাসী কচুও বোঝে না। কিন্তু ফরাসী যে কলা চেনে না এমনতো নয়। কলা দেখলে তো সে ঠিকই চিনতে পারে এবং গবগব করে খায়। তাহলে সমস্যাটা কোথায় এখানে? সমস্যা এখানেই যে ফরাসী মস্তিস্কে কলার যে

দ্যোতিত আছে তার সাথে বাংলাভাষার দ্যোতক 'কলা'র কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। 'কলা' শুনে 'কলা' বুঝতে হলে বাঙলা জানা দরকার, নিদেনপক্ষে উত্তর বা পূর্ব ভারতের অন্য কোন ভাষা। ফরাসী মস্তিস্কে 'কলা'র যে দ্যোতকটি রয়েছে তার সাথে সম্পর্ক আছে ফরাসী ভাষার দ্যোতক 'বানান' এর। 'কলা' বাংলা ভাষার সঙ্কেত, 'বানান' ফরাসী ভাষার সঙ্কেত। সুতরাং আলাদা আলাদা ভাষা মানে আলাদা আলাদা অনেকগুলো সঙ্কেতের সমষ্টি।

সিনেমাহলে, ক্লাসরুমে বা সেমিনার কক্ষে গোল বৃত্তের মধ্যে সিগারেটের উপর আড়াআড়ি দাগ দেওয়া একটি ছবি : দেখা যায়। এই ছবিটিতে সিগারেটের অবিকল প্রতিরূপ নেই। কিন্তু এই ছবি দেখে আপনি বোঝেন যে সিনেমাহলে সিগারেট খাওয়া নিষেধ। সুতরাং এটি একটি দ্যোতক। এই দ্যোতকটির সাথে কোন বিশেষ স্থানে সিগারেট না খাওয়ার কমবেশী সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রতিমার মতো পুরোপুরি সাদৃশ্য নেই। যদি কোন দ্যোতকের সাথে দ্যোতিতের কমবেশী সাদৃশ্য থাকে তবে তাকে আমরা বলবো 'প্রতীক' বা symbol। 'গোল বৃত্তে ক্রস দেয়া সিগারেট' একটি প্রতীক।

প্রতিমার মতোই প্রতীকের একটি সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আছে। যে কোন ভাষাভাষী ব্যক্তি যেমন কলার ছবি দেখে 'কলা' চিনতে পারে তেমনি কলার প্রতীক দেখেও মস্তিস্কে 'কলা'র দ্যোতিত সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু 'সঙ্কেত' কোনমতেই সার্বজনীন চিহ্ন নয়। সি.আই.এ'র গুপ্তচর কে.জি.বি'র সঙ্কেত বুঝতে পারে না। যখন কোন দরজার উপর বাংলায় লেখা থাকে 'প্রসাধন' তখন কোন ফরাসীভাষীর বোঝার সাধ্য নেই যে দরজাটি টয়লেটের। এর কারণ, 'প্রসাধন' কোন সিম্বল বা প্রতিমা নয়, এটি একটি সঙ্কেত। সঙ্কেতের ক্ষেত্রে দ্যোতকের সাথে দ্যোতিতের সম্পর্ক একান্ত আর্বিত্রিক। আর্বিত্রিক সম্পর্কের ধরণটাই এমন যে সম্পর্ক থাকলে থাকবে, না থাকলে নেই। সম্পর্ক যেখানে আছে সেখানে প্রশ্ন তোলা যাবে না সম্পর্ক থাকার কারণ কি আর সম্পর্ক যদি না থাকে সেক্ষেত্রেও জিগ্যেস করা যাবে না, সম্পর্ক নেই কেন?

ভাষাসৃষ্টির সূচনাপর্বে কথ্য ভাষার ধ্বনিদ্যোতক গুলোর সাথে এগুলোর দ্যোতিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল কিনা অর্থাৎ এগুলো প্রতিমা জাতীয় চিহ্ন ছিল কিনা তা এত হাজার বছর পরে বলা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এটা জানা গেছে যে লিখিত ভাষার অন্যতম উপাদান 'বর্ণ' প্রতিমা ও প্রতীক জাতীয় চিহ্ন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ্রীক আলফা, আরবী আলিফ বা বাংলার 'স্বরে-অ' তিনটি বর্ণেরই মূল হচ্ছে একটি সুমেরীয় বর্ণ যা তৈরী হয়েছিল 'গরুর মাথার আদলে'। প্রাচীন মিশরীয় ভাষা লেখা হতো চিত্রলিপিতে। 'খোকা কলা খায়' বাক্যটি লিখতে এই লিপিতে একটি শিশু, একটি কলা একটি হা-করা মুখ ব্যবহার করা হতো (এটি উদাহরণ মাত্র)। সুতরাং এটি একান্তই একটি 'প্রতিমালিপি'। এই প্রতিমালিপি বিবর্তিত হয়ে হাজার খানেক বছর পরে সৃষ্টি হয় কীলক লিপি। কীলক লিপির দ্যোতকগুলোর সাথে নির্দেশিতের সাদৃশ্য ছিল বটে কিন্তু চিত্রলিপির তুলনায় অনেক কম ছিল এই সাদৃশ্য। কীলক লিপিকে বলা যেতে পারে 'প্রতীকলিপি'। এই কীলকলিপি জাতীয় কোন লিপি থেকেই প্রাচীন সুমেরিয়দের হাতে বর্ণমালা বা সঙ্কেতলিপি উদ্ভাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই লিখনপদ্ধতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়। ব্যতিক্রম দূরপ্রাচ্যের দেশ চীন ও জাপান। এ দু'টি দেশে এখনও প্রতীকলিপিতে ভাষা লিখিত হয়ে চলেছে।

৩. মানবভাষা সঙ্কেতের সমষ্টি

মানবভাষায় অনেক প্রতীক ব্যবহৃত হয় কিন্তু শুধু প্রতীক দিয়ে ভাষা সৃষ্টি হয় না। কেন হয় না? হয় না, কারণ প্রতীকের এমন একটি গুন নেই যা সঙ্কেতের আছে। সঙ্কেত সাধারণতঃ একা ব্যবহৃত হয় না।

আগেই বলা হয়েছে ভাষা অনেকগুলো সঙ্কেতের সমষ্টি। একটি সঙ্কেত অন্য একটি সঙ্কেতের কোন পাশে বসলো - এই তথ্যটি ভাষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'খোকা কলা খায়' বাক্যের তিনটি সঙ্কেতের মধ্যে কোনটি কোন জায়গায় বসবে তা মোটামুটি স্থির হয়ে থাকে ভাষার ব্যাকরণে। সঙ্কেতের এই পারস্পরিক অবস্থানকে বলা হয় 'সিন্টাক্টিক' যাকে আমরা বাংলায় বলবো 'বিন্যাস'। প্রতীকের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'সিগারেট খাওয়া বারণ' - দ্যোতিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয় তিনটি দ্যোতক : ১. সিগারেট, ২. গোল বৃত্ত এবং ৩. আড়াআড়ি দাগ বা ক্রস চিহ্ন। সিগারেটের প্রতীকটি বৃত্তের বাইরে, উপরে বা নীচে থাকলে প্রতীকের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। লোকে তখনও বুঝতে পারবে : 'সিগারেট খাওয়া বারণ'। কিন্তু 'মানুষ বাঘ মারে' না বলে যদি কেউ বলে 'বাঘ মানুষ মারে' তবে সঠিক 'সঙ্কেতায়নের' কাজ প্রায় থেমে যায় বললেই চলে।

মানব ভাষার প্রধান উপাদান সঙ্কেত। সঙ্কেত সৃষ্টির জন্য মানুষের দরকার ছিল ১.দ্যোতক সৃষ্টি করতে পারা এবং ২. দ্যোতিতের সাথে দ্যোতকের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া। দ্যোতক আর দ্যোতিতের এই সম্পর্কটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাসৃষ্টির জন্য। মানব মস্তিস্ক আর মানবদেহ এ দু'টিই একসঙ্গে অবদান রেখেছে প্রতীক সৃষ্টিতে। মানুষের শরীর বহু লক্ষ বছর ধরে এর জন্যে ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছে। প্রথমতঃ মুখ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য ১. গলার হলকুম (এ্যাডামস্ অ্যাপল) বা ল্যারিঙসকে নীচে নামতে হয়েছে, ২.দাঁতকে মুখের ভিতরের দিকে ঢুকে বর্তমান অবস্থায় আসতে হয়েছে; ৩. জিহ্বাকে প্রায় সবত্রগামী হতে হয়েছে মুখগহ্বরে, ৪. মস্তিস্ককে যথেষ্ট বিকশিত হতে হয়েছে যাতে দ্যোতক সৃষ্টি ও এর সাথে দ্যোতিতের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো নেই।

শিম্পাঞ্জীর এই সব বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছে বলে শিম্পাঞ্জী কয়েকটি স্বরধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু শিম্পাঞ্জীর পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। রূপকথায় পশুপাখির কথা বলার যে গল্প আমরা শুনি তা একান্তই গালগল্প। পশুদের কোন ভাষা নেই, অন্ততঃ মানুষের মতো ভাষা নেই কারণ কোন পশুর দেহমনই মানুষের মত বিকশিত নয়। পশুরা যেমন কথা বলতে পারে না তেমনি ছবিও আঁকতে পারে না। কোন পশুরই যে প্রতীক সৃষ্টির ক্ষমতা নেই তার প্রমাণ সবচেয়ে বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জীটিও একটি দুই বছরের মানবশিশুর মতো ছবি আঁকতে পারে না। বাঁদর বা শিম্পাঞ্জী যা আঁকে তাকে কোনমতেই ছবি বলা যায় না। এগুলো নির্জলা বাঁদরামী যদিও অনেক গবেষক সেগুলোকে 'পশুশিল্প' বলে দিব্যি বাজারে চালিয়ে দেন এবং এসব পাশবিক চিত্রকলার সমজদারেরও অভাব হয় না।

ছবি আঁকার সাথে কথা বলার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়, কারণ ভাষা সঙ্কেতের সমষ্টি এবং যে কোন সঙ্কেতের দুই দিকে থাকে দুই দুইটি ছবি। ছবি আঁকার ক্ষমতা মানবমস্তিস্কেও একদিনে তৈরী হয়নি। গুহামানব তার মস্তিস্ক বিবর্তনের কোন পর্যায়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছে বা ভাষা আবিস্কার করেছে তা আমরা জানি না। মর্গান ও এঙ্গেলসের মতে, আগুন আবিস্কারেও আগে বা সমসাময়িক সময়ে মানুষ স্পষ্ট উচারণে কথা বলতে শেখে। ছবি আঁকার ক্ষমতা অর্জন করার পর মানুষ কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করেছে - এ রকম ধারণা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক নয়।

৪. সাদৃশ্যমূল্য ও নির্দেশিত

প্রতিমা (icon), প্রতীক (symbol) আর সঙ্কেত (sign) এই তিনটিই আলাদা আলাদা চিহ্ন। নির্দেশিতের সাথে এদের দ্যোতকের সাদৃশ্যের তারতম্যের ভিত্তিতে এই তিনটি চিহ্নের পার্থক্য সূচিত হয়। নির্দেশিতের সাথে দ্যোতকের সাদৃশ্যকে বলা হয় 'সিম্বলিক ভ্যালু' (symbolic value) যাকে বাংলায় আমরা বলতে পারি 'সাদৃশ্যমূল্য'। সব চিহ্নের ক্ষেত্রে দ্যোতক ও নির্দেশিতের সাদৃশ্যমূল্য এক নয়। সাদৃশ্যের এই তারতম্যকে একটি স্কেল বা মাপকাঠিতে দেখানো যেতে পারে : প্রতিমা > প্রতীক > সঙ্কেত। নির্দেশিতের সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য প্রতিমার। সাদৃশ্যের মাপকাঠিতে অতঃপর আসে প্রতীক এবং সবশেষে সঙ্কেত। সিগারেটের আলোকচিত্র হবে সিগারেটের 'প্রতিমা'। এর সাদৃশ্যমূল্য সবচেয়ে বেশী। সিগারেটের প্রতীকের সাদৃশ্যমূল্য এর চেয়ে কম। লিখিত বা উচ্চারিত এই উভয় প্রকারের শব্দ : 'সিগারেট' একটি সঙ্কেত। সাদৃশ্যমূল্যের মাপকাঠিতে সঙ্কেতের স্থান সবার নিচে। সঙ্কেতের ক্ষেত্রে দ্যোতক ও নির্দেশিতের মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্যই আছে কোনও না কোন ভাবে কিন্তু সেই সাদৃশ্য দৃশ্যমানতো নয়ই, মানুষের বোধেরও অগম্য।

কোন চিহ্নে সর্বমোট চারটি উপাদান থাকতে পারে : ১. দ্যোতক, ২. দ্যোতিত, ৩. নির্দেশিত ও ৪. বিন্যাস। প্রতীক ও প্রতিমা জাতীয় চিহ্নের ক্ষেত্রে নির্দেশিতের একটি ভূমিকা আছে, কারণ নির্দেশিতের সঙ্গে দ্যোতকের সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে এই দু'টি চিহ্নের অস্তিত্ব। কলার প্রতিমা যদি একেবারেই বাস্তবের কলার মতো না হয়ে আপেলের মতো হয় তবে সেটিকে কলার প্রতিমা হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। প্রতিমার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিত থাকে এবং এই নির্দেশিতের সাথে চিহ্নের সাদৃশ্য অপরিহার্য (এমনি অপরিহার্য যে নির্দেশিত না থাকলে প্রতিমাও থাকবে না!)। কিন্তু প্রতীকের ক্ষেত্রে এ রকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন প্রকার নির্দেশিত নেই, এমন প্রতীকও রয়েছে। ♥ প্রতীকটি 'ভালোবাসা' দ্যোতিত করে। এই প্রতীকটির কোন নির্দেশিত নেই। 'ভালোবাসা' মনের একটি অনুভূতি, এটি বাস্তবের কোন বস্তু নয়।

সঙ্কেত জাতীয় চিহ্নের ক্ষেত্রে নির্দেশিতের ভূমিকা আরও কম। সাদৃশ্যমূল্য যত কমতে থাকে, নির্দেশিতের ভূমিকাও তত কমতে থাকে চিহ্নের ক্ষেত্রে। প্রতিমার ক্ষেত্রে দ্যোতক ও নির্দেশিতের সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী, সুতরাং প্রতিমার জন্যে নির্দেশিত থাকা অপরিহার্য। প্রতীকের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত কম। স্বাভাবিকভাবেই প্রতীক জাতীয় চিহ্নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত থাকার বাধ্যবাধকতা কম এবং সে কারণেই অনেক প্রতীকের নির্দেশিত না থাকলেও চলে। সঙ্কেত জাতীয় চিহ্নে দ্যোতক ও নির্দেশিতের সম্পর্ক আর্বিত্রিক অর্থাৎ সঙ্কেতের সাদৃশ্যমূল্য শূন্য। সাদৃশ্যমূল্য যেহেতু শূন্য সেহেতু নির্দেশিত থাকা বা না থাকায় কিছু আসে যায় না। ভাষার জন্যে নির্দেশিত কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়।

ভাষিক চিহ্ন বা 'সঙ্কেত' একটি ত্রিভূজ বা ত্রিশুল (ট্রাইয়াড) যার প্রথম কোনে আছে দ্যোতক, দ্বিতীয় কোনে দ্যোতিত আর তৃতীয় কোনে আছে সিন্ট্যাক্টিক বা বিন্যাস। ভাষিক সঙ্কেতের ক্ষেত্রে দ্যোতক ও দ্যোতিত এই দুই শুলের যে কোন একটি ভাঙা থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দ্যোতক শুলটি ভাঙা থাকতে পারে অর্থাৎ কোন ভাষিক চিহ্নের দ্যোতক না থাকতে পারে। 'ঋক বই পড়ে' বাক্যের ক্রিয়ারূপটি বর্তমান কাল দ্যোতিত করে কিন্তু 'বর্তমান কাল' দ্যোতক কোন উপাদান এই ক্রিয়ারূপে নেই। 'পড়্' ধাতুর সাথে যে এ-বিভক্তি যুক্ত হয়েছে সেটি নামপুরুষের দ্যোতক, বর্তমান কালের দ্যোতক নয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে কোন চিহ্নে দ্যোতক আছে কিন্তু দ্যোতিত শুলটি ভাঙা অর্থাৎ চিহ্নটির কোন দ্যোতিত নেই। ফরাসী ভাষায় ক্রিয়ার নঞর্থক রূপে দু'টি নঞর্থক উপাদান ব্যবহার করা হয় : ইল ন্য লি

পা (আক্ষরিক অনুবাদ : সে না পড়ে না)। এই দ্যোতক দু'টির মধ্যে যে কোন একটির কোন দ্যোতিত নেই, কারণ লিখিত ফরাসীতে দ্বিতীয় উপাদানটি (পা) ও কথ্য ফরাসীতে প্রথম উপাদানটি (ন্য) ব্যবহার না করলেও চলে।

এ ধরণের ক্ষেত্রে অবশ্য 'এই সঙ্কেতে কোন দ্যোতক বা দ্যোতিত নেই' - এমনটি বলা যাবে না। বলতে হবে : এই সঙ্কেতের দ্যোতক বা দ্যোতিত স্থানটি শূন্য আছে অর্থাৎ স্থান আছে কিন্তু সেই স্থানে কোন উপাদান নেই। কিন্তু বিন্যাস গুলটি কখনই ভাঙা থাকতে পারবে না কোন সঙ্কেতে। ভাষিক চিহ্ন বা সঙ্কেতের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাস বা সিন্টান্টিক থাকা বাধ্যতামূলক ('ক' ডানদিকে বসবে 'খ' এর না বামদিকে)। সব প্রতিবেশেই অন্য সঙ্কেতের ডানে বা বামে যে কোন দিকে বসতে পারে এমন ভাষিক সঙ্কেত বিরল। উদাহরণ : ভাষায় কিছু সঙ্কেত শব্দের ডানদিকে যুক্ত হয়। এগুলো 'উপসর্গ' (উদাহরণ : প্রতি-কার, উপ-সর্গ)। কিছু সঙ্কেত শব্দের বামদিকে যুক্ত হয় : কর-আ, ঢাকা-আই। এগুলো 'প্রত্যয়'। উপসর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় আবার প্রত্যয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এমন ভাষিক সঙ্কেতের উদাহরণ দেওয়া মুস্কিল।

ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশিতের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই কিন্তু পরোক্ষ ভূমিকা আছে। 'কলম' দ্যোতকটি আপনার পিতামহের মস্তিস্কে যে দ্যোতিতের সৃষ্টি করতো আপনার মস্তিস্কে তা করে না। আপনার ছোটবেলায়ও কলমের যে দ্যোতিত ছিল আপনার মস্তিস্কে আজ আর তা নেই। এর মূলে আছে 'কলম' বস্তু বা নির্দেশিতটির দ্রুত বিবর্তন। কত রকম কলমই না বের হয়েছে বাজারে গত বিশ বছরে! নূতন নূতন নির্দেশিতের জন্য সৃষ্টি হয় নূতন নূতন দ্যোতক। এর ফলে বদলে যায় দ্যোতিত। 'লেখা' বলতে আপনার পিতামহ যা বুঝতেন তা আপনি বোঝেন না। আজকাল অনেকেই কম্পিউটারে লেখেন, কলম ব্যবহার করেন শুধুমাত্র স্বাক্ষর দেবার জন্য। সুতরাং এক শ' বছর আগে 'লেখা' দ্যোতকটির যে দ্যোতিত ছিল বাঙালীর মনে, এক শ' বছর পরে সেই দ্যোতক আর নেই। এভাবে নির্দেশিতের পরিবর্তনের কারণে দ্যোতক ও দ্যোতিত উভয়েরই পরিবর্তন সাধিত হয়। দেখা যাছে, ভাষাসৃষ্টিতে বহিঃপ্রকৃতি আর মানব মস্তিস্কের মিথস্ক্রীয়ার (ইন্টার-এ্যাকশন) ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালী, ফরাসী বা ইংরেজী ভাষামানসের সাথে বহির্জগতের মিথস্ক্রীয়া এক রকম হয় না। ভাষায় ভাষায় পার্থক্য হওয়ার পেছনে মিথস্ক্রীয়ার এই পার্থক্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৫. রূপক : নূতন সঙ্কেত

ধ্বনি অনেক রকমই সৃষ্টি করতে পারে মানুষ মুখ দিয়ে কিন্তু সব ধ্বনি ভাষায় ব্যবহার করা যায় না। মানুষের ভাষাধ্বনি সৃষ্টির ক্ষমতা সীমিত। বাংলায় খান দশেক স্বরধ্বনি আর খান ত্রিশেক ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিয়ে চল্লিশটার মতো ভাষাধ্বনি রয়েছে। একটি ভাষায় খুব বেশী হলে শ'খানেক ব্যবহারযোগ্য ধ্বনি থাকতে পারে। এই শ' খানেক ধ্বনি দিয়ে লক্ষ লক্ষ শব্দ তৈরী হয়। আরও বহু লক্ষ শব্দ তৈরী হতে পারে কিন্তু সব ধ্বনির সাথে সব ধ্বনি পাশাপাশি বসতে পারে না সব ভাষায়। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক ভাষাতেই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে হর হামেশাই শব্দ শুরু হতে পারে। কিন্তু বাংলায় নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে কোন শব্দ শুরু হতে পারে না। 'ঙখলা' শব্দটি বাংলায় চলবে না যদিও 'শৃঙ্খলা''য় আপত্তি নেই।

যত দ্যোতকই তৈরী করুক মানুষ, মানব মস্তিস্কে দ্যোতিতের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। দ্যোতিতের সংখ্যা বেশী কেন? এর একটি কারণ পৃথিবীতে বস্তুর সংখ্যা অসীম। দ্বিতীয় কারণ, মানুষের মস্তিস্ক নামক যন্ত্রে বিশেষ দু'টি মডিউলের উপস্থিতি। এই দু'টি মডিউলের মধ্যে একটির কাজ হবে ক-নামক উপাদান ও খ-নামক উপাদানের মধ্যে যোগ-বিয়োগ করা আর অন্যটির কাজ হবে ক এর সাথে খ এর সাদৃশ্য খুঁজে বের করা। প্রথম মডিউলটির নাম হতে পারে পরিগণক মডিউল এবং দ্বিতীয়টির নাম হতে পারে 'অ্যানালোজি' (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'অনুসার') মডিউল। কম্পিউটার যেমন বিভিন্ন প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করে তেমনি মানুষের মস্তিস্কেও বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে। পণ্ডিতদের কারও কারও মতে এসব প্রোগ্রাম মস্তিস্কে জন্মাবধি থাকে। অন্য কিছু পণ্ডিতের মতে, জন্মের সময় শিশুর মস্তিস্ক শুধুই একটি কম্পিউটার। বড় হতে হতে চারপাশের জীবন ও জগতের সাথে মিথস্ক্রীয়া (ইন্টারঅ্যাকশন) করে মস্তিস্কে প্রোগ্রাম তৈরী হতে থাকে। একটি, দু'টি নয়, হাজার রকমের প্রোগ্রাম রয়েছে মানুষসহ যে কোন প্রাণীর মস্তিস্কে। এক একটি প্রোগ্রাম এক একটি মডিউলের অংশ।

পরিগণক মডিউলের কাজ বস্তুর সংখ্যা গণনা করা। শুধু মানব মস্তিস্ক নয়, এর চেয়ে অনেক কম উন্নত যেমন পাখির মস্তিস্কেও এই পরিগণক মডিউল রয়েছে। যে কোন পাখিও একটি বিস্কিট আর দুইটি বিস্কিটের তফাৎ বোঝে। পরিগণক মডিউলের আবার বিভিন্ন উপমডিউল আছে মানবমস্তিস্কে যার মধ্যে একটির কাজ হছে যোগ করা : 'ক' দ্যোতিতের সাথে 'খ', 'ক+খ' এর সাথে 'গ'... ইত্যাদি। একে আমরা বলতে পারি 'যোজনা' (উপ)মডিউল। অনুসার মডিউলের প্রধান একটি কাজ হছে কোন একটি দ্যোতককে কমবেশী সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি দ্যোতিতের সঙ্গে যুক্ত করা। একেবারে আনকোরা, নূতন একটি দ্যোতক সৃষ্টি করার চাইতে এ কাজটি সহজতর। একবার আগুনে হাত দিয়ে শিশুর হাত পুড়েছে। শিশু দ্বিতীয় বার আর হাত দেয় না, আগুনের ছবি হলেও না, কারণ, মস্তিস্কের অনুসার মডিউল শিশুকে বলে : 'এটা আগুন! হাত দিলে আবার হাত পুড়বে!' পুড়বেই এমন কোন কথা নেই, তবুও অনুসার মডিউল ধরে নেয়, হাত পুড়বেই যে কোন আগুনে হাত দিলে অর্থাৎ অনুসার মডিউল আগুনের দ্যোতিতটাকে আগুনের ছবিসহ আগুনের সব ধরণের দ্যোতকের উপর আরোপ করে।

রূপক শব্দ সৃষ্টিতে এই অনুসার মডিউলের ভূমিকা রয়েছে। ফরাসীতে যে প্রাণীটির নাম 'সুরি' বাংলায় তার নাম 'নেংটি ইঁদুর'। বাঙালীর ভাষা মানসে 'নেংটি ইঁদুর' এক ধরণের ইঁদুর বই নয়। বাংলায় যে প্রাণীর নাম 'বাদুর' ফরাসীতে তার নাম 'শোভসুরি' বা 'টেকো নেংটি ইঁদুর'। কিন্তু ফরাসী ভাষামানসে ইঁদুর আর নেংটি ইঁদুর দু'টি আলাদা জিনিষ। 'সুরি' শব্দে ইঁদুরের নামগন্ধ নেই। কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাদুর প্রাণীটিকে ফরাসী ভাষামানস একটি 'টেকো নেংটি ইঁদুর' মনে করেছে যেমন করে বাংলা ভাষামানস এক ধরণের 'সবুজ রঙের লাফিয়ে চলা পোকা'র নাম দিয়েছে 'সাপমাসী'। ফরাসীতে এই একই পোকার নাম 'সতরেল' অর্থাৎ যে লাফায়। বাংলা শব্দটিতে পোকাটির স্বভাবের কোন প্রতিফলন নেই কিন্তু ফরাসী 'সতরেল' শব্দে পোকাটির একটি বিশেষ স্বভাব (লাফানো) প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে একটি দ্যোতিতের বৈশিষ্ট্য অন্য একটি দ্যোতিতের উপর আরোপ করে মানবমস্তিস্কের অনুসার মডিউল নুতন দ্যোতক সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। অনুসার আর যোজনা মডিউলের কারণে একটি দ্যোতিতের সাথে অন্য একটি দ্যোতিত যোগ হয়ে নিত্যনূতন সঙ্কেতের সংখ্যা অবিরাম বেড়ে চলে : সাপ + মাসি = সাপমাসি, টাক + ইঁদুর = শোভসুরি ইত্যাদি।

কবিদের মস্তিস্কে এই অ্যানালোজি মডিউলটি সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয়। ‘উপমাই কবিতা’ কথাটি বলেছিলেন হাজার দু'য়েক বছর আগে অ্যারিস্টটল আর ইদানিং কালে বাঙালী কবি জীবনানন্দ। ধরা যাক, কবির মস্তিস্কে সৃষ্টি হলো এক নূতন দ্যোতিত ‘পাখীর নীড়ের মতো চোখ’। যে চোখে পিচুটি পড়ে বা ছানি পড়ে ঝাপসা হয়ে যায় যে চোখ, সে রকম সাধারণ কোন ‘চোখ’ নয় এই ‘পাখীর নীড়ের মতো চোখ’। মাঝি এক জিনিষ ‘মনমাঝি’ অন্য জিনিষ। ‘মনমাঝি’ আপনাকে সদরঘাট থেকে জিঞ্জিরায় নিয়ে যেতে পারে না বা পিঞ্জিরার ‘মনপাখি’ কে ছোলা খাওয়ানোও সম্ভব নয়। কবিদের এই সব নিত্যনূতন দ্যোতক যখন সাধারণ্যে গৃহীত হয় তখন নূতন দ্যোতক আর এর দ্যোতিতটি ভাষার অংশ হয়ে যায়।

রূপক শব্দেরও পরিবর্তন আছে। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। ভাষা জীবনের অংশ। সুতরাং ভাষাও স্বতঃপরিবর্তনশীল। এক সময় ‘বিদ্যালয়’ ছিল একান্তভাবে ‘বিদ্যার আলয়’। শিক্ষার্থীকে সেই আলয়ে সার্বক্ষণিকভাবে বাস করতে হতো (তুলনা করুন, ‘যমালয়’, ‘বেশ্যালয়’)। প্রথম দিকে ‘বিদ্যালয়’ একটি রূপক শব্দ ছিল, এখন অতি সাধারণ একটি শব্দ। সংস্কৃতে ‘উদার’ শব্দটির অর্থ (= দ্যোতিত) ছিল ‘(বৃহৎ) উদর আছে এমন কোন প্রাণী’ অর্থাৎ ঘোড়া। এটিও রূপক শব্দ এবং নিঃসন্দেহে কোন না কোন কবি শব্দটির শিলান্যাস করে থাকবেন সুদূর অতীতে। পরে শব্দটির অর্থ বদলে যায়। শব্দটির বর্তমান অর্থ : ‘বৃহৎ হৃদয় আছে এমন কোন ব্যক্তি’।

কবি যা খুশী কল্পনা করতে পারেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে করেন না। মস্তিস্কের অনুসার মডিউল অজ্ঞাত কিছু নিয়ম মেনে চলে। কোন দু'টি ভাষাতেই উপমাসৃষ্টি একভাবে হয় না। ভারতবর্ষে সুন্দরী নারীর মুখের সঙ্গে চাঁদের উপমা দেয়া হয়। এ উপমা ফরাসী সাহিত্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত। সাধারণ বাঙালীর প্রেমপত্রে ‘ময়নাপাখী’ বা ‘গোলাপ’ প্রেমিকার উপমা, কিন্তু সাধারণ ফরাসী প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের বিপরীত সঙ্গীকে সম্বোধন করে ‘ওগো আমার বাঁধাকপি’ (মোঁ শু) বা ‘ওগো আমার হাঁস’ বা ‘ওগো আমার হরিণী‘ (‘মোঁ কানার’ বা ‘মা বিশ’) বলে। বাংলা কবিতায় এ ধরণের উপমা ব্যবহার করা কোন কবির পক্ষে সম্ভব নয় (যদিও হরিণী চলতে পারে!), তা যত মৌলিক আর আন্তরিকই তিনি হোন না কেন! সুতরাং উপমাসৃষ্টির ব্যাপারটিও ভাষার নিয়মের অধীন।

ভাষার পুরো ব্যাপারটাই এক ধরণের মূর্তি নিয়ে খেলা। ‘মূর্তিপূজা’ও বলতে পারেন, যদি আপত্তি না থাকে। কোন মূর্তি ঠিক কোন জায়গায় বসবে তা ঠিক করে ব্যাকরণ। উল্টাপাল্টা বসিয়েছেন কি মরেছেন। খেলা ভঙ্গ। পূজা পণ্ড। পূজামণ্ডপে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের হামলাও হয় অনেক সময়। যেমন আনন্দবাজারীরা লেখে : ১ বৈশাখ, ২১ ফেব্রুয়ারী। এটি ছোট খাট একটি হিন্দী-প্রভাবিত হামলা বাংলা ভাষার উপর। অনেক পূজারী নিজের ইচ্ছেমত মূর্তি সাজায়। এক দেবতার পূজার নিয়মে শুরু করেন তারা অন্য দেবতার পূজা। এর উদাহরণ : কবিতায় শ্রী মধুসূদন দত্ত বা গদ্যে কমলকুমার মজুমদার। কমলকুমার ফরাসী বাক্যবিন্যাসে বাংলা শব্দ সাজাতে চেষ্টা করেছেন। মূর্তির নূতন বিন্যাস যদি সবাই মেনে নেয় তবে সেটা হয়ে দাঁড়ায় স্টাইল। এর ফলে ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে। যদি পূজার নুতন এই পদ্ধতি কেউই মেনে না নেয় তবে তাকে বলা হয় অকারণ বিদ্রোহ। চোরাগোপ্তা হামলা আর অকারণ বিদ্রোহ ভাষার ক্ষতি সাধন করে।

সিনেমায়ও প্রতিমা ও প্রতীকের ব্যবহার হয়। চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস' ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় শ্রমিকেরা কারখানায় ঢুকছে। পরের দৃশ্যে দেখানো হয় এক পাল ভেড়া ঢুকছে খোঁয়ারে। এখানে ভেড়ার পাল শ্রমিকের দলের রূপক। 'আধুনিক যুগে শ্রমিকের সাথে ভেড়ার কোন ফারাক নেই' - এই দ্যোতিতটি সৃষ্টি করেছে শ্রমিক ও ভেড়ার দ্যোতকের পর পর ব্যবহার। চলচিত্রের ইংরেজী পরিভাষায় দ্যোতিত সৃষ্টির এই বিশেষ টেকনিকটির নাম 'মন্তাজ'। চিত্রশিল্পেও প্রতিমা ও প্রতীকের বহু বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

৬. চিহ্নবিজ্ঞান বা সেমিওলজি

প্রতিমা, প্রতীক, সঙ্কেত সহ যাবতীয় চিহ্নের বর্ণনা ও ব্যাকরণ 'সেমিওলজি' নামক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। গ্রীক শব্দ 'সেমেইয়ন' আর 'লোগোস' সমাসবদ্ধ হয়ে এই শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। 'সেমিওলজি' শব্দটা ১৭৫২ সাল থেকেই ফরাসী ভাষায় ব্যবহৃত হছে। তখন সেমিওলজি ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশ। সে যুগে এর কাজ ছিল, রোগের উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয় করা। উপসর্গগুলো রোগের লক্ষণ বা চিহ্ন (জ্বর হলে যেহেতু গায়ে ব্যথা ব্যথা করে সেহেতু গায়ে ব্যথা ব্যথা করলে ভাবতে হবে জ্বর হয়েছে... ইত্যাদি)। ১৯১০ সালে সুইস ভাষাবিজ্ঞানী Ferdinand de Saussure (১৮৫৭-১৯১৩) এই শব্দটিকে চিহ্নবিজ্ঞানের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন। উত্তর আমেরিকান ঘরানায় এই শাস্ত্রের নাম 'সেমিওটিকস্'। উত্তর আমেরিকায় সেমিওটিকসের গোড়াপত্তন করেন Charles Sanders Peirce (১৮৩৯-১৯১৪)। সস্যুর আর পার্সের মতে সমাজে চিহ্নসমূহের উদ্ভব, বিকাশ ও বিন্যাস বিচার বিশ্লেষণ করবে যে শাস্ত্রটি তারই নাম হবে 'সেমিওলজি' বা 'সেমিওটিকস্'। ভাষা চিহ্নের সমষ্টি। সুতরাং একদিক থেকে দেখলে ভাষাবিজ্ঞান সেমিওলজি বা চিহ্নবিজ্ঞানেরই একটি শাখা (ফরাসী সেমিওলগ বা 'চিহ্নবিজ্ঞানী' Roland Barthes এই মতই পোষণ করতেন)।

তবে চিহ্নবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য আছে। আগেই বলা হয়েছে সব ধরণের চিহ্ন দিয়ে ভাষা সৃষ্টি হয় না। ভাষা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন 'সঙ্কেত' জাতীয় চিহ্নের। একাধিক সঙ্কেত একত্রিত হয়ে ভাষা সৃষ্টি হয়। অন্যান্য চিহ্নের সাথে সঙ্কেতের পার্থক্য দু'টি ক্ষেত্রে : ১. সঙ্কেতের ক্ষেত্রে দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্ক আর্বিত্রিক কিন্তু অন্যান্য চিহ্নের ক্ষেত্রে এ দু'টি উপাদানের মধ্যে কমবেশী সাদৃশ্য রয়েছে; ২. সব ধরণের চিহ্নেরই সিন্টান্টিক বা বিন্যাস থাকতে পারে কিন্তু সঙ্কেতের ক্ষেত্রে চিহ্নসমূহের পারস্পরিক অবস্থান বা সিন্টাক্টিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং 'সঙ্কেত' চিহ্ন হলেও বিশেষ এক ধরণের চিহ্ন এবং এই সঙ্কেতের সমষ্টি যেহেতু ভাষা সেহেতু ভাষাবিজ্ঞানকে সেমিওলজির শাখা না বলে একে স্বতন্ত্র একটি বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষপাতী অনেকে।

৭. বিমূর্ত ধারণা ও ঈশ্বর

'কলা' দ্যোতকটির একটি সর্বজনপরিচিত নির্দেশিত আছে। মোটা মোটা আঙ্গুলের মতো হলুদ রঙের এই ফলটি আমরা সবাই চিনি। বাস্তবের একটি ফল এই কলা। কিন্তু অনেক দ্যোতক যেমন, ধরুন 'ভালোবাসা' বা 'জনগন' এর কোন নির্দেশিত নেই। এসব শব্দের শুধু দ্যোতক ও দ্যোতিত রয়েছে। নির্দেশিত বা রেফারেন্ট নেই এমন শব্দকে বলা হয় বিমূর্ত শব্দ। বিমূর্ত শব্দ নিয়ে হাজারো ঝামেলা। যা আমার জন্য 'কলা' তা দুনিয়ার সবার জন্যে 'কলা'। কিন্তু আমি যে অনুভূতিটিকে 'ভালোবাসা' বলে মনে করি সেই একই অনুভূতিকে আপনি 'ভালোবাসা' বলে মনে করেন না।

এ রকম আর একটি বিমূর্ত শব্দ 'ঈশ্বর'। দেশে দেশে ঈশ্বরের হাজার রকম চেহারা। সমভূমির ঈশ্বর আর মরুভূমির ঈশ্বরের প্রকৃতি এক রকম নয়। ভারতবর্ষের যমুনাতীরের 'কাউবয়' শ্রীকৃষ্ণ গরুর গায়ে হেলান দিয়ে বাঁশি বাজাতে পারেন পরের বৌ, নিজের গার্লফ্রেণ্ড রাধাকে জড়িয়ে ধরে। মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরণের ঈশ্বরকে পত্রপাঠ 'কতল' করা হবে আর ইওরোপীয় দেশগুলোতে এরকম ঈশ্বরের ভিসা পাওয়াই মুশকিল হবে, পূজা পাওয়াতো অনেক দূরের কথা।

ঈশ্বরের রূপ কেমন? ধর্মগুলোর উত্তর : তাঁকে কল্পনা করা যায় না। তাঁর রূপ কল্পনা করতে গেলে নাকি 'বাক্যের সহিত মন ফিরিয়া আসে'। ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করা না গেলেও তাঁর গুনগুলোর কথা আমরা সবাই জানি। তিনি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি ধর্মগ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। তিনি মানুষকে পাপ ও পূণ্যের বোধ দিয়েছেন। পূণ্য করলে মানুষকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন স্বর্গে আর পাপ করলে সোজা নরকে ('নরক' মানে 'নো রক', এখানে কোন রক গানের হৈহুল্লুর চলবে না!)। যখন মানুষের পাপ-পূন্যের বোধ লোপ পায় তখন তিনি নবী পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে (মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলোতে) অথবা নিজেই চলে আসেন পৃথিবীতে (ভারতবর্ষের ধর্মে)। এই প্রত্যেকটি গুন মানুষেরও আছে। মানুষ আইন রচনা করতে পারে। কোন মানুষ আইন না মানলে তাকে পাঠানো হয় জেলখানায়। আইন সব সময় মেনে চললে তাকে কোন পুরস্কার অবশ্য দেয়া হয় না। তবে খুব ভালো কোন কাজ করলে তাকে পুরস্কার দেয়া হয় : নোবেল, অস্কার, পদ্মশ্রী, একুশে পুরস্কার, ইত্যাদি। যোজনা (উপ)মডিউলের প্রভাবে মানুষের বিভিন্ন গুন যোগ হয়ে মানব মস্তিস্কে তৈরী হয়েছে ঈশ্বরের রূপক।

ঈশ্বর ধারণায় অ্যানালোজি বা অনুসারের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সব দেখেন। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এটি একটি বড় তফাৎ। মানুষ সব দেখে না। একজন মানুষ যখন মন্ত্রিয়লে আছে তখন সে একই সাথে চট্টগ্রামে থাকতে পারে না। ঈশ্বর কিন্তু পারেন। সুতরাং ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আসেন তখন স্বর্গে কে থাকে? - এ ধরণের প্রশ্ন করা যাবে না, কারণ তিনি একই সাথে সব জায়গায় থাকতে পারেন। সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার গুনটি অভূতপূর্ব মনে হতে পারে মানুষের কাছে, কারণ মানুষের এ গুনটি নেই। কিন্তু যৌক্তিকভাবে চিন্তা করলে এটা অসম্ভব নয়। 'ক' যদি এক জায়গায় থাকতে পারে তবে সব জায়গায় থাকতে অসুবিধা নেই, কারণ সব জায়গা হছে অনেকগুলো এক জায়গার সমষ্টি। মানুষ কোন নির্দিষ্ঠ সময়ে শুধু একটি মাত্র স্থানে থাকতে পারে। অতিমানব ঈশ্বর সব জায়গায় থাকতে পারেন।

পৃথিবীর সব ধর্মের প্রধান গ্রন্থে ঈশ্বরের বর্ণনা দেয়া আছে। সব ধর্মগ্রন্থকেই এক সময় ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করা হতো। এখনও অনেক ধর্মাবলম্বীর দৃঢ় বিশ্বাস : অন্ততপক্ষে তাদের ধর্মগ্রন্থটি মানুষের সৃষ্টি হতে পারে না, অন্য ধর্মেরগুলো হলেও হতে পারে! মানুষ কর্তৃক লিখিত হোক বা না হোক, ধর্মগ্রন্থগুলো মানব ভাষায় লেখা। মানবভাষা মানব মস্তিস্কের সৃষ্টি। মানব ভাষায় এমন কিছু প্রকাশ করা যায় না যা মানুষ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। গ্রীক পুরাণের অশ্বমানব সেন্টরের উত্তমাঙ্গ মানুষের মতো, শরীরের বাকী অংশ ঘোড়ার মতো। ছাগমানবের পায়ে রয়েছে ছাগলের মতে খুর। ইসলামী শাস্ত্রমতে, স্বর্গীয় বাহণ বোরাকের রয়েছে মেয়েমানুষের মতো মুখ আর ঘোড়ার মতো শরীর। মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মাথায় হরিণের মতো দুটো শিঙ ছিল। দেবতা গনেশের মুখ নেই, আছে হাতির মতো শুঁড়। মহিষাসুর নামক অসুরের মাথা ছিল মহিষের মতো। আগের দিনের মানুষের এসব কল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মানুষ তার দেখা দু'টি আলাদা প্রাণীকে কল্পনায় জোড়া দিয়েছে। এটা মস্তিস্কের যোজনা মডিউলের কাজ। মানুষ যখন 'সোনার পাহাড়' কল্পনা করে তখন সে নুতন কিছুই সৃষ্টি করে না। সোনাও সব মানুষ চেনে,

পাহাড়ও সবাই দেখেছে। সুতরাং 'সোনার পাহাড়' এর রূপকটি বুঝতে কোন মানুষেরই কোন অসুবিধা হয় না। যে কোন রূপক কল্পনায় (যেমন ধরুন, 'মনমাঝি', 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ') উপমান ('মন', 'পাখীর নীড়) আর উপমিত ('মাঝি', 'চোখ') মানুষের পূর্বপরিচিত হতেই হয়। অন্যথায় রূপক সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না কোন কবির পক্ষেই।

আপনারা কি কখনও অন্য গ্রহের প্রাণী ই.টি'র ছবি দেখেছেন? কিম্ভূতকিমাকার তার চেহারা : লম্বা লম্বা কান, বামনের মতো আকার, সব মিলিয়ে বিছিরি ধরণের একটি মানুষ। মানুষ ই.টি কখনও দেখেনি। ই.টি'র কল্পনা করার সময় মানুষ নিজের ছবিটারই একটি প্রতিরূপ তৈরী করেছে। কেন এই বিশ্রী প্রতিরূপ? মানুষ হয়তো চায় ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণীটি একমাত্র সে নিজেই হবে। অন্য গ্রহের প্রাণী গুনে বা ক্ষমতায় মানুষকে ছাড়িয়ে গেলেও রূপে মানুষের তুলনায় সব সময় ন্যুন থাকবে, অন্ততঃ মানুষের দৃষ্টিতে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে মানুষের কিন্তু এমন কোন ঈর্ষা নেই। হিন্দু দেবদেবীর মুর্তিই দেখুন বা গ্রীক দেবদেবীর মূর্তিই দেখুন, মানুষের কল্পনায় ঈশ্বর সুন্দরতম পুরুষ বা নারী।

৮. ঈশ্বর ও মূর্তিপূজা

পরিগণক মডিউলের কারণে মস্তিস্ককে গুনতে হয়। গুনতে হলে অবয়ব বা মূর্তি চাই। বিমূর্ত জিনিষ গোনা যায় না। 'পানি' বস্তুটি গোনা যায় না বলে মানুষ বলে: এক 'গ্লাস' পানি বা এক 'বিন্দু' জল। এখানে 'গ্লাস' আর 'বিন্দু' দিয়ে পানিকে অবয়ব দেয়া হলো। দুধের স্বাদ মানুষ ঘোলে মেটায়। নির্দেশিত নেই? কুচ পরোয়া নেই, কল্পনা করো। বানিয়ে নাও মনে মনে বস্তুটিকে। মানব মস্তিস্ক বিমূর্ত ভাব সহ্য করতে পারে না। গ্রীকরা কল্পনা করেছিল ভালোবাসার এক দেবীকে। আর্যরা কল্পনা করেছিল ভালোবাসার দেবতা মদনকে। হাতে তার পঞ্চ শর। এদিক ওদিক ছুঁড়েই চলেছে তীরগুলো। তাতেই নারীপুরুষ একে অন্যের প্রেমে পড়ছে। আধুনিক কালে তীরবিদ্ধ তিনকোনা হৃদপিণ্ড ভালোবাসার প্রতীক।

মানুষের ঈশ্বর কল্পনার মূলেও রয়েছে মানবমস্তিস্কে মূর্তির অত্যাবশ্যকতা। মূর্তিছাড়া মস্তিস্কের কাজ চলে না। নাড়ু হাতে হামাগুড়ি দেয়া শিশু, হনুমান, গরু, বৃক্ষ, মায়ের কোলে শিশু, ক্রস, আকাশের তারা, বাঁকানো চাঁদ, জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রেমিক প্রেমিকা, নারীপুরুষের গোপনাঙ্গ ইত্যাদি কত রকম মূর্তিই না মানুষ কল্পনা করেছে ঈশ্বরের। এমন কোন ধর্ম নেই যেটিতে কোন না কোন ফর্মে মূর্তিপূজা নেই। মূর্তি ছাড়া পূজা বা প্রার্থনা কোনটাই করা যায় না। মূর্তি দুই রকম হতে পারে : বাস্তব মূর্তি ও ভাবমূর্তি। বাস্তব মূর্তি হিন্দু ধর্মে 'প্রতিমা' নামে পরিচিত। কিন্তু সেমিওটিকসের পরিভাষায় 'প্রতিমা'র একটি ভিন্ন অর্থ থাকবে। বাস্তব বা ভাবমূর্তি আর সেমিওটিকসের 'প্রতিমা' এক কথা নয়। বাস্তবমূর্তি এবং ভাবমূর্তি এই দু'টির কোনটিরই নির্দেশিত নেই। বাস্তবে দূর্গা, কালী বা গণেশের অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে চিহ্নবিজ্ঞানে 'প্রতিমা' এমন একটি চিহ্ন যার তিনটি উপাদান রয়েছে : দ্যোতক, দ্যোতিত ও নির্দেশিত।

বাস্তব মূর্তির সাথে ভাবমূর্তির তফাৎ আছে। ভাবমূর্তির শুধুই দ্যোতিত আছে, কোন নির্দেশিত নেই। কেউ জানে না, বাংলাদেশের ভাবমূর্তির নির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুটি দেখতে কেমন। কিন্তু এই ভাবমূর্তি যে আছে তার প্রমাণ এই যে প্রায়ই বিরোধীদলের লোকেরা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। মৌলবাদীরা যেমন মাঝে মাঝে হিন্দুমন্দিরে কালীমূর্তি ভাঙে তেমনি দেশের তথাকথিত শত্রুদের হাতে দেশের ভাবমূর্তিও হরহামেশা নষ্ট হয়। নষ্ট হওয়ার কথা যখন উঠছে তখন এটা নিশ্চিত, মূর্তিটিও আছে কোথাও না

কোথাও। সরকার মাটিপাথরের মূর্তির জন্যে ততটা উদ্বিগ্ন হয় না। কিন্তু নিদারুন বিচলিত হয় ভাবমূর্তির জন্য। ভাবমূর্তি ভাঙছে বলে যাদের সন্দেহ হয় যেমন, মুনতাসীর মামুন, শাহরীয়ার কবির এদের অনেক দিন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় ভাবমূর্তিকে অটুট রাখার জন্য। প্রাচীন গ্রীক জাতি বা বর্তমানের হিন্দু ধর্মালম্বীরা যদি মুর্তির জন্য দরদ দেখায় তবে তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু ইসলামে মূর্তিপূজা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। মুসলিমপ্রধান এই বাংলাদেশে একটা (ভাব)মূর্তির রক্ষার জন্য এই অনর্থক অতিব্যস্ততার কারণ কি? সমাজ মনের অবচেতনে রয়ে যাওয়া হিন্দু-বৌদ্ধ অতীতের অনুৎপাটিত কোন শেকড় এই মূর্তিরক্ষার উৎকণ্ঠার কারণ কিনা সমাজমনোবিজ্ঞানীরা আশা করি তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।

এখন 'অফিসিয়ালি' একমাত্র হিন্দুরাই বাস্তব মূর্তির পূজা করে। গ্রীক-রোমান আর আরবরা আগে মূতিপূজা করতো, এখন ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম আর বৌদ্ধধর্মে এখনও এক ধরনের (যীশু ও বুদ্ধের) মূর্তিপূজা চালু আছে। একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোতে যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয় তখন মূর্তি ব্যবহার করা না হলেও প্রার্থনাকারীর মস্তিস্কে কোন না কোন ভাবমূর্তি অবশ্যই সৃষ্টি হয়। সেই ভাবমূর্তি মানুষেরই মতো মানুষের প্রার্থনা শুনে দয়াপরবশ হয়। এই ভাবমূর্তিই সব দেখেন, সব জানেন, সব বোঝেন। 'জানা', 'বোঝা' বা 'দেখা'র মতো জৈবিক বা মানবিক গুনগুলো যদি কোন কিছুর থাকে তবে সেটি কোন বস্তু হতে পারে না। এটি একটি মূর্তি, তবে ভাবমূর্তি। 'ভালোবাসা' বা 'সৌন্দর্যের' মতো বিমূর্ত ধারণার ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনি এই ভাবমূর্তির অবয়বও জনে জনে আলাদা হতে পারে।

এ রকম ঘটতে বাধ্য, কারণ মানব মস্তিস্ক একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যে কোন যন্ত্রের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া তার নিজস্ব মডিউলগুলোর উপর নির্ভর করে। এছাড়া যে কোন কম্পিউটার জাতীয় যন্ত্র ডাটা বা প্রদত্ত তথ্য নির্ভর। ইনপুটে যা যা আছে তার উপরই নির্ভর করবে এর আউটপুট। সুতরাং মানবভাষায় যে ঈশ্বরের বর্ণনা দেয়া সম্ভব বা ধর্মগ্রন্থগুলোতে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে তা একান্তই মানুষের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার জোড়াতালি দেয়া একটি চিত্র।

আপনারা হয়তো বলবেন, 'মানলাম, ঈশ্বর মানুষের মস্তিস্কের সৃষ্টি, কাল্পনিক একটি মূর্তি বা ছবি। তাতে কি এটা প্রমাণ হলো যে ঈশ্বর নেই?' না, তা নয়। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে মানুষের মস্তিস্ক যে ঈশ্বরকে কল্পনা করে বা করতে পারে সেই ঈশ্বর নেই। যেমন, সোনা আছে, পাহাড়ও আছে কিন্তু 'সোনার পাহাড়' নেই। ঘোড়া আছে, মানুষও আছে কিন্তু 'ঘোড়া মানুষ' নেই... ইত্যাদি। 'অকল্পনীয়', 'অচিন্তনীয়' যে ঈশ্বরের কথা আমরা শুনি মানুষের মস্তিস্ক তাঁকে ধারণ করতে পারে না। মানুষ যাঁর কথা ভাবতে পর্যন্ত পারে না (বর্ণনা করার কথা বাদই দিলাম!) তিনি থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি! এ বছর কোন ছবি অস্কার পেলো তাতে অন্ধের কি যায় আসে?

৯. ঈশ্বর ও সংখ্যা

ঈশ্বর কি বিমূর্ত কোন ধারণা? বিমূর্ত অবশ্যই তবে বিমূর্ততারও বিভিন্ন রকমফের আছে। 'ভালোবাসা', 'সৌন্দর্য' বা 'ঈশ্বর' বিমূর্ত সব ধারণা। এসব চিহ্নের কোন রেফারেন্ট বা নির্দেশিত নেই। কিন্তু মস্তিস্কে এগুলোর দ্যোতিত আছে। মস্তিস্কের বিশেষ একটি অনুভব এর নাম 'ভালোবাসা'। মস্তিস্কে অনুভূত বিশেষ একটি 'গুন' এর নাম সৌন্দর্য্য। কিন্তু এসব অনুভব বা বোধ সর্বত্র বিরাজমান নয়। আপনার চার পাশে ভালোবাসা বা সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে নেই। সেখানে ঘৃণা আছে, বিশ্রীভাব আছে। ঈশ্বর বিমূর্ত কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিরাজমান না হন তবে তাঁর পক্ষে অস্তিত্ববান হওয়া অসম্ভব, কারণ

সেক্ষেত্রে এমন কিছু স্থান থাকবে যেখানে ঈশ্বর থাকবে না। যদি ব্রহ্মাণ্ডের কোন একটি জায়গায়ও ঈশ্বর না থাকেন তবে মস্তিস্কের অ্যানালোজি মডিউল সব জায়গায় তাঁর অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করবে।

ঈশ্বরের সর্বত্র বিরাজিত থাকার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায় যদি মানুষের বোধের আওতায় ঈশ্বর ছাড়াও অন্ততঃ অন্য একটি ধারণা থাকে যেটি সর্বত্র বিরাজমান। আছে তেমন একটি জিনিষ। জিনিষটি হচ্ছে 'সংখ্যা'। সৃষ্টির কোথাও আপনি ১, ৩, ৫ সংখ্যাগুলো দেখাতে পারবেন না। অথচ আপনার চার পাশে যে দিকেই তাকান সেদিকেই সংখ্যার ছড়াছড়ি। আপনার বাঁদিকে ৫টি চেয়ার, ডানদিকে ৩টি জলের গ্লাস, সামনে সুন্দর ১টি মেয়ে (বা ছেলে) আর পেছনে একাধিক শত্রু। যেখানে কিছু নেই সেখানে আছে ০ (শূন্য)। সংখ্যার এইসব সঙ্কেত আবিস্কৃত হয়েছিল ভারতে, পরে আরবদের হাত দিয়ে সেগুলো গিয়ে পৌঁছায় ইওরোপে। গ্রীকরা আর রোমানরাও সংখ্যাসঙ্কেত (II, V, X, C, L) আবিস্কার করেছিল কিন্তু কোন কাজের ছিল না সেগুলো। গ্রীক-রোমান দেবদেবীর মতো গ্রীক-রোমান সংখ্যাসঙ্কেতগুলো আজ ইতিহাসের অংশ। ভাষায় রোমান সংখ্যার ব্যবহার আজকের যুগে অনেকাংশে আলঙ্কারিক। সংখ্যার প্রধান ব্যবহার যে গণিত তাতেই রোমান সংখ্যার ব্যবহার নেই। ভারতবর্ষে সংখ্যাসঙ্কেতগুলো (পশ্চিমে যেগুলো 'আরবীয় সংখ্যা' নামে পরিচিত) উদ্ভাবিত না হলে আধুনিক গণিতের উদ্ভব আদৌ হতো কিনা সে ব্যাপারে পণ্ডিতেরা সন্দেহ পোষণ করেন।

আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, সংখ্যাকে কেন 'প্রতীক' না বলে 'সঙ্কেত' বলছি। এগুলো প্রতীক নয় কারণ প্রথমতঃ এগুলোর দ্যোতকের সাথে (যেমন : ১) এর সাথে মানবমস্তিস্কে সৃষ্টি হওয়া দ্যোতিত 'এক' এর কোন সাদৃশ্য নেই। দ্যোতক ১ এবং দ্যোতিত 'এক' এর মধ্যে যে সম্পর্কটি আছে সেটি একান্তই কাকতালীয় বা আর্বিত্রিক। এই আর্বিত্রিকতা সঙ্কেতের একটি প্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ অন্য যে কোন সঙ্কেতের মতো, সংখ্যার ক্ষেত্রেও সিন্টাক্টিক বা বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১ এর ডান পাশে ০ বসান, ০ এবং ১ উভয়েরই মূল্য বাড়বে। ১ এর বাম দিকে শূন্য বসিয়ে দেখুন, ০ এবং ১ কারও মূল্যই এতটুকু বাড়বে না। পারস্পরিক অবস্থান যখন এতই গুরুত্বপূর্ণ তখন সংখ্যাগুলো সঙ্কেত না হয়ে যায় না।

সংখ্যার এই বোধ যদি সত্য হয় তবে ঈশ্বরের বোধটিও সত্য হতে বাধা নেই। 'ঈশ্বর নেই' - এটা প্রমাণ করা যাবে না। এক রকম বাঁচিয়ে দিলাম 'দাদু'কে (আমার বাপের বাপ ঠাকুরদা' আর মায়ের বাপ দাদু দু'জনের নামই ছিল 'ঈশ্বর'!) তার মানে কি তিনি আছেন? 'আছেন' বললেই তো ঈশ্বরের নাতিকে আপনারা এবার প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। 'ঈশ্বর কি স্বর্গে আদমকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাচার করার ক্ষমতা রাখেন?' 'তাঁর মহান ইচ্ছায় প্রেসিডেন্ট বুশ কি নিশ্চিত হেলে যাবে (হেল মানে নরক)?' 'এই ঈশ্বর কি সর্বশক্তিমান?' তাই যদি তিনি হয়ে থাকেন তবে দড়ির এমন কোন গিঁট কি তিনি দিতে পারেন যা তাঁর নিজেরও খোলার ক্ষমতা নেই?' 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে কি আমার অমুকের কানাডার ভিসা হবে?' 'আচ্ছা ঠিক আছে, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন শুধু : ঈশ্বর কি সব দেখেন?'

এত সব ভুল প্রশ্নের কি জবাব দিই বলুন! যতই হই না কেন ঈশ্বরের নাতি, আমার '(নব)সাংখ্য দর্শন' (?) এর ক্ষমতারও একটা সীমা আছে! আপনাদের প্রশ্নগুলোতে মানুষের যাবতীয় গুন এই যেমন ধরুন, পাচার করা, হেলে থাকা, গিঁট খোলা, সব দেখা... আপনারা ঈশ্বরের উপর আরোপ করছেন। ঈশ্বর কিছুই দেখেন না, কাউকে কোথাও পাঠান না তিনি। পাঠাতে পারেন কি পারেন না, সব দেখার ক্ষমতা আছে কি নেই - এসব প্রশ্ন অবান্তর। আচ্ছা, আমি যদি বলি, আমাদের ভুলো কুকুরটা ওদের পুসি বিড়ালটাকে ই-

মেল করেছে, তবে কি আপনি অবাক হন? নিশ্চয়ই হন, কারণ আপনি ভালো করেই জানেন, ভুলো বা পুসির পক্ষে ইলেক্ট্রনিক মেলামেশা সম্ভব নয়। ভুলো, পুসি বা ঈশ্বর এরা কেউই মানুষের ক্যাটাগরীতে পড়েন না। সুতরাং মানুষের গুনাবলী এদের কারও মধ্যেই থাকবে না - এটাই স্বাভাবিক। ঈশ্বর সৃষ্টির কর্তা কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। সৃষ্টিশীলতা মানুষের স্বভাবগত একটি গুন। আমরা বলেছি, মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর এই গুনটি নেই। যখনি মানুষ ঈশ্বরকে 'সৃষ্টিকর্তা' বলে তখনি নিজের সৃষ্টিশীলতার গুনটি সে ঈশ্বরের উপর আরোপ করে।

১০. দেবতা ও ঈশ্বর : ধ্রুপদ ও খেয়াল

সাম্প্রতিক জীন গবেষণায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে যাবতীয় বৈষম্য সত্বেও পৃথিবীর সব মানুষ একই প্রজাতির সদস্য। গবেষণা হয়েছে এমন একটি জাতি নিয়ে যেটি নিজেদের সবচেয়ে অমিশ্রিত বলে মনে করতো এতদিন। জাতিটি হচ্ছে জাপানী। জাপানীদের পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে জাপানীদের মধ্যে খাঁটি জাপানী আছে মাত্র ৪%ভাগ। বাকী ৯৬%ভাগ জাপানী নাগরিক চীনা ও কোরীয় বংশদ্ভূত। পৃথিবীর সব মানুষ যেহেতু এক, সব মানুষের মস্তিস্কের গঠনও মোটামুটি এক। জন্মের পর পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিথস্ক্রীয়ার কারণে ভাষা ও সংস্কৃতির মতো মানুষের মানসিক কাঠামোও এক এক দেশে এক এক রকম হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মানুষের মস্তিস্ক এক, সেহেতু ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিতে মিলও থাকে অনেক। মিল অবশ্যই আছে। পৃথিবীর ভাষাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মিল না থাকলে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভব হতো না।

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কী একটি বিশ্বব্যাকরণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বব্যাকরণের দু'টি অংশ : ১. প্রিন্সিপল (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'ধ্রুপদ') আর ২. প্যারামিটার (সম্ভাব্য বাংলা প্রতিশব্দ : 'খেয়াল')। চমস্কী মনে করেন, পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণের ধ্রুপদ অংশটুকু এক। শুধু খেয়াল অংশের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ আলাদা হয়। চমস্কীর ধ্রুপদ ও খেয়াল শুধুমাত্র ভাষার দ্যোতক অংশের জন্য প্রযোজ্য। দ্যোতিত অংশে কি ঘটে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি রাজী নন। আমি মনে করি, ভাষার দ্যোতিত অংশেও ধ্রুপদ ও খেয়ালের অস্তিত্ব আছে। আর্থ ধ্রুপদের অস্তিত্বের কারণেই সম্ভবতঃ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ সম্ভব হয়। সব ভাষাবিজ্ঞানী অবশ্য এ ধরণের সম্ভাবনার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ নন।

চমস্কীকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, ঈশ্বর হচ্ছে মানুষের সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি হওয়া একটি ধ্রুপদ। সব সমাজে সব কালে ঈশ্বর ছিল। কিন্তু ভাষার মতোই ঈশ্বরের রূপ আর ধর্মের স্বরূপ এক রকম হতে পারেনি, কারণ সব কালে ও সব দেশে পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানব মস্তিস্কের মিথস্ক্রীয়া সমান হয়নি। সুতরাং ঈশ্বর ধারণার ধ্রুপদ অংশটুকু সব সমাজে কমবেশী এক, কিন্তু এই ধারণার খেয়াল অংশটুকু আলাদা। এ কারণে সব সমাজের সব ধর্মের ঈশ্বরের খেয়ালখুশী বা আচরণও এক রকম নয়। ধ্রুপদ 'ঈশ্বর'কে আমরা বলতে পারি ঈশ্বর আর খেয়াল ঈশ্বরকে বলা যেতে পারে 'দেবতা'। 'দেবতা' আর ভাবমূর্তি একই। ঈশ্বর জাতি-ধর্ম-ব্যক্তি নির্বিশেষে এক। কিন্তু 'দেবতা' বা ভাবমূর্তির রূপ আলাদা। প্রতিটি মানুষের মস্তিস্কে আলাদা আলাদা দেবতার সৃষ্টি হয়।

সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনঁ দ্য সস্যুর ভাষাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা জনে জনে আলাদা। আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বাংলা বলি। প্রত্যেক ব্যক্তির এই যে আলাদা

আলাদা ভাষা - সস্যুর ফরাসীতে এর নাম দিয়েছিলেন ‘পারোল’ যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি ‘বাণী’। আমাদের প্রত্যেকের আলাদা একটি বাংলা ‘বাণী’ রয়েছে। এই বাংলা বাণী বাংলা ‘ভাষা’র অংশ। পৃথিবীতে যদি ২০ কোটি বাঙালী থাকে তবে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাটি হবে তাদের ২০ কোটি বাংলা বাণীর সমষ্টি। একই ভাবে বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে যদি ৬০০ কোটি মানুষ থাকে তবে ভাবমূর্তি বা দেবতাও আছে ৬০০ কোটি।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা মাত্র ৩৩ কোটি দেবতার কথা বলতেন এবং তাই শুনে দেবসমাজে পরিবারপরিকল্পনার অভাব নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর একজন কিন্তু দেবতা ৩৩ কোটি। ব্যপারটাকে কি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যে পৃথিবীর তখনকার লোকসংখ্যা ৩৩ কোটি বলে ভাবতেন তাঁরা! উপনিষদের ঋষিরা ভাবতেন, বেদের শত শত দেবতা এক ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেমিওটিকসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাবতে পারি, কোটি কোটি দেবতা বা ভাবমূর্তি মিলিত হয়ে সমাজ মানসে সৃষ্টি হয় বিমূর্ত ঈশ্বরের ধারণা। এই ধারণাটিকে ‘দ্যোতিত’ বলা মুস্কিল কারণ এটি একক কোন মূর্তি নয়। সুতরাং ঈশ্বরের বহু দ্যোতক আছে বিভিন্ন ভাষায় (‘ঈশ্বর’, আল্লাহ্, খোদা, God, Dieu...) কিন্তু একক কোন দ্যোতিত নেই।

একক ব্যক্তির পক্ষে যেমন সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা জানা সম্ভব নয় তেমনি একক ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ ঈশ্বরকে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। ব্যক্তি মানুষের মনে ঈশ্বরের যে মূর্তিটির সৃষ্টি হয় সেটি একটি দ্যোতিত কিন্তু এটি ঈশ্বরের দ্যোতিত নয়। ঈশ্বর যদি একজনই হয়ে থাকেন তবে তাঁর একটিই দ্যোতিত থাকা উচিত। ঊনবিংশ শতকে ফ্রেগো নামে এক জার্মান দার্শনিক লিখেছিলেন, কোন দু’টি মানুষই এক চাঁদ দেখে না, কারণ কোন দু’টি মানুষের চোখের রেটিনার আকার এক নয়। চাঁদের সাথে ঈশ্বরের একটি পার্থক্য আছে : চাঁদের একটি নির্দেশিত আছে (আকাশে ঝুলতে থাকা ‘চাঁদ’)। প্রত্যেকের মনে সৃষ্টি হওয়া চাঁদের দ্যোতিতকে এর নির্দেশিতের সাথে মিলিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কোন নির্দেশিত নেই। কোন দু’টি মানুষের মস্তিস্কই এক নয়। সুতরাং আলাদা আলাদা মানুষের মস্তিস্কে ঈশ্বরের আলাদা আলাদা দ্যোতিত সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

আসল ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন তবে তিনি হবেন ‘অরূপ রতন’। যতই রূপসাগরে ডুব দিক মানুষ্, এই অরূপ রতনের সন্ধান অন্ততঃ মানুষের পাবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনব্যাপী এই ‘জীবনদেবতা’র ব্যর্থ সন্ধান করেছেন। এত খুঁজে শেষ পর্যন্ত কি হলো শুনুন, রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাষায়: ‘দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন শেষ বার উচারিল, পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় : কে তুমি? পেল না উত্তর।’ উত্তর আসার কথা নয়, কারণ ঈশ্বর যেহেতু মানুষ নন, সেহেতু প্রশ্ন বা উত্তর কোনটারই ধার তিনি ধারেন না। আবার উত্তর পেলেও কোন লাভ হতো না রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষের ভাষা বাংলায়। কোন উত্তর যদি এসেও থাকে তবে তা এসেছিল গায়েবী ভাষা বা দৈববাণীতে। এ ভাষা কবি বা নবী দু’জনের এক জনেরও বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। যত ক্ষমতাই থাক না কেন এই দুই ব্যক্তির, এঁরা দু’জনেই মানুষ, এঁদের মস্তিস্ক এবং ভাষা দুইই মানুষের।

১১. ঈশ্বর : প্রয়োজনীয় একটি চিহ্ন

অনেক হুজুগে নাস্তিক (জ্ঞানী নাস্তিক যারা অর্থাৎ যারা জেনে শুনে নাস্তিক হয়েছেন তাদের কথা আলাদা) ঈশ্বর ও ধর্ম - এ দু’টি চিহ্নকে সমাজ থেকে চিরতরে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। তাদের মতে : ঈশ্বর আর

ধর্মের কারণে বহু যুদ্ধ, বহু দাঙ্গা, বহু রক্তপাত হয়েছে। এই 'কুসংস্কার' দু'টি মানুষে মানুষে বিভেদই সৃষ্টি করে শুধু। কিন্তু রক্তপাততো বিজ্ঞানের কারণেও কম হয়নি। এ্যাটম বোমা থেকে শুরু করে ল্যান্ড মাইন পর্যন্ত এত বিচিত্র সব মারণাস্ত্র দাড়িওয়ালা মোল্লা বা টিকিধারী ব্রাহ্মণেরা তৈরী করেনি। শুধু ধর্ম নয়, বিজ্ঞানও মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়েছে বহুবার। কিন্তু তাই বলে সমাজ ও জীবন থেকে বিজ্ঞানকে বাদ দেবার দাবী কেউ করেন না।

বিজ্ঞান যেমন বোমা বানিয়েছে তেমনি কম্পিউটারও বানিয়েছে। ধর্ম বহুবার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে মানব সভ্যতার গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে, অস্বীকার করি না, কিন্তু মানুষের বহুবিধ উন্নতিও এই ধর্মের কারণেই হয়েছে। শুধুমাত্র বাইবেলের অনুবাদ করার প্রয়োজনে পৃথিবীর কত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখা হয়েছে, রচিত হয়েছে অভিধান। ধর্ম যদি না থাকতো তবে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-প্যাগোডার মতো এত সুন্দর সব স্থাপত্য নিদর্শনই বা আমরা পেতাম কিভাবে? ধর্মের কারণে কত কত দর্শন, কাব্য রচিত হয়েছে। কোরান-বাইবেল-গীতা-ত্রিপিটককে ঈশ্বরের বাণী স্বীকার করুন বা না করুন, এসব রচনার দার্শনিক ও সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। ধর্মই যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়। বর্তমান শতকে ধর্মের কারণে অনেক দাঙ্গা হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু বড় বড় যুদ্ধগুলোর একটিও ধর্মের কারণে হয়নি। সুতরাং মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মতো ধর্মেরও নেতিবাচক ও ইতিবাচক এই উভয় জাতীয় অবদান রয়েছে।

সমাজ মানসের ক্রমবিবর্তনের ফলে ঈশ্বর ধারণাটি তৈরী হয়েছে মানুষেরই একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে। যদি মৃত্যু না থাকতো, জীবনে পদে পদে বিপদ না থাকতো, তবে ঈশ্বর ধারণার সৃষ্টি হতো না মানুষের মনে। উন্নত দেশগুলোতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা বেশী, কারণ সেখানে গড়পড়তা মানুষের জীবনে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা আছে। অনিশ্চিত জীবনে এমন কাউকে মানুষের দরকার যে তাকে নিরাপত্তা দেবে। জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সামাজিক শৃঙ্খলা একান্ত জরুরী। আমরা একে অন্যের ক্ষতি করবো না। কেন করবো না? করবো না, কারণ তা পাপ। পাপ করলে অসুবিধা কি? অসুবিধা আছে। পৃথিবীতে শাস্তি পাবে তোমার পাপের জন্যে আর জীবৎকালে শাস্তি যদি নাও পাও, তবে মৃতুর পরে পাপী তুমি সোজা যাবে নরকে আর পূণ্যবানেরা তোমাকে বাই বাই জানিয়ে ড্যাং ড্যাং করে রওয়ানা দেবে স্বর্গের পানে। সোজা হিসাব। ঈশ্বর ধারণার এই ফাংশনাল দিকটিকে উপেক্ষা করা চলে না। সমাজ চালাতে গেলে অনেক ফাংশনাল ধারণার প্রয়োজন হয়। 'সত্য' আর 'ন্যায়বিচার' এ রকম দু'টি ফাংশনাল ধারণা। সত্য বা ন্যায়বিচার বলে হয়তো আসলে কিছু নেই কিন্তু সত্য বা ন্যায়বিচারকে বাদ দিয়েও সমাজ চালানো সম্ভব নয়।

ঈশ্বর ও ধর্মকে কোনমতেই সমাজের সব ধরণের বৈষম্যের উৎস বলা যাবে না। ধনী-গরীবের যে বৈষম্য তা ধর্মের সৃষ্টি নয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে ধর্মকে নির্বাসন দিয়েও শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করা যায়নি। সমাজে শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে চলে, কারণ প্রতিটি মানুষের মস্তিস্কের গঠন এক হলেও প্রতিটি মস্তিস্কের প্রকৃতি আলাদা, পারিপার্শ্বিকতার সাথে তার মিথস্ক্রীয়াও এক নয়। সুতরাং প্রতিটি মানুষ অন্য একটি মানুষের চাইতে কিছুটা আলাদা। গভীরতর বিশ্লেষণে এই সত্যটিই উজ্জ্বলতর হবে যে ধর্ম না থাকলেও সমাজে বৈষম্য বা বিভেদ সৃষ্টি হতে বাধা নেই। সৃষ্টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য। লোকে যেমন বলে : হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না তেমনি সমাজ যতদিন আছে ততদিন বৈষম্যও থাকবে। তবে আমাদের চেষ্টা থাকবে, এই বৈষম্য যাতে যথা সম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

বিজ্ঞান, ধর্ম, ঈশ্বর... ইত্যাদি ধারণা ইতি-নেতি-নিরপেক্ষ অর্থাৎ এগুলো নেতিবাচকও নয়, ইতিবাচকও নয়। ব্যবহারের কারণেই এসব ধারণা ভালো বা খারাপ বলে মনে হয়। দোষ ঈশ্বরেরও নয়, বিজ্ঞানেরও নয়, দোষ মানবচরিত্রের। অসৎ লোকের হাতে পড়লে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই অপব্যবহার হয়ে থাকে। ধান্দাবাজ নেতারা ধর্ম আর ঈশ্বর ধারণার অপব্যবহার করে সমাজে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সৎ ও চরিত্রবান নেতারা এ দু'টি ধারণার সঠিক ব্যবহার করে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে পারেন। বহুজনের হিত ও সুখ ধর্মের লক্ষ্য। প্রায় প্রত্যেক ধর্মই মানুষে মানুষে সমানাধিকারের কথা বলে এবং সাধারণতঃ দরিদ্রের পক্ষে থাকে। খ্রীষ্টধর্ম এমন কথাও বলেছে যে 'সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট চলে গেলেও যেতে পারে কিন্তু ধনী ব্যক্তি স্বর্গে যেতে পারবে না।' সুতরাং 'ধর্ম' ও 'ঈশ্বর' - এ দু'টি ধারণাকে জোর করে বাদ না দিয়ে সমাজ-অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান, ধর্ম ও ঈশ্বর এক একটি বৃক্ষের মতো। বৃক্ষে কাঁটাও আছে, ফলও আছে। কাঁটা বাদ দিয়ে ফল পেড়ে খেতে জানতে হবে। কাঁটার যন্ত্রণার ভয়ে পুরো গাছটিকেই যদি কেটে ফেলা হয় তবে এর ফল থেকেও সমাজ বঞ্চিত হবে। যে কোন ধর্ম হচ্ছে কাঁঠালের মতো। কাঁঠালের সবটা মানুষ খেতে পারে না। গরু সবটা খেতে পারে। যারা ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে মানতে চায় তাদের সঙ্গে গরুর মিল আছে। ধর্ম যদি মানব সমাজে কোন সমস্যার কারণ হয়েই থাকে তবে তা যতটা না ধর্মের দোষে তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষের দুর্বুদ্ধির দোষে। কাঁঠালের কোষ না খেয়ে কেউ যদি আঠা খাওয়া শুরু করে তবে তা কাঁঠালের দোষ নয়। কাঁঠাল যেহেতু 'জাতীয় ফল' সেহেতু তার মধ্যে রস, আঠা, কাঁটা, বীচি, ভূতি সবই থাকবে, কারণ যে কোন জাতি বারো ভূতের আড্ডা এবং সব ভূতের প্রয়োজন সমান নয়। নির্বোধেরা কাঁটালের আঠা বাঁচিয়ে চলতে পারে না। নির্বোধের যদি রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়ি থাকে তবে তার পক্ষে কাঁঠাল খাওয়া আরও কঠিন। গল্পের কাবুলিওয়ালার মতো নির্বোধদের চুল-দাঁড়িতে ধর্মের আঠা জড়িয়ে যায়, রস পেটে ঢুকে না।

পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর প্রত্যেকটিরই বয়স হয়ে গেছে হাজার বছরের বেশী। হাজার বছর আগের মানুষ আর আজকের মানুষে পার্থক্য অনেক। হাজার বছর আগের সমাজের সাথে আজকের সমাজের মিল সামান্যই। ধর্মের নিয়মগুলো তৈরী হয়েছিল হাজার বছর আগের মানুষ আর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে। হাজার হাজার বছর পরে এই সব নিয়মের উপযোগিতা সমান না হলেও প্রজন্মক্রমে মানতে মানতে 'ধর্ম' ও 'ঈশ্বর' ধারণা মানুষের বিশ্বাসের অন্তর্গত উপাদান হয়ে গেছে। এই দু'টি ধারণাকে কিছু লোক অন্তরে লালন করে কিন্তু অনেকেই প্রকাশ্যে জাহির করতে চায়। আপনারা গায়ে দিন বা না দিন, এ ব্যাপারে আমি আমার নিজের ব্যবহার করা একটি ফতুয়া আপনাদের দিতে চাই : 'বিশ্বাস হচ্ছে অন্তর্বাসের মতো, সবাইকে দেখাতে নেই। যারা মনের বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে জাহির করতে চায় তারা সুপারম্যানের মতো প্যান্টের উপর জাঙ্গিয়া পড়ে থাকে!'

হাজার বছরে মানুষ মেধায়-মননে বেড়েছে অনেক কিন্তু জাঙ্গিয়া সেই একই রয়ে গেছে। কিছু কিছু দুবুদ্ধিজীবি ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন চান। পাগলামী! কালিদাসের মেঘদূত কি আবার নূতন করে লেখা যাবে? মেঘদূতে যদি কোন ভুল থেকেই থাকে তবে সেই ভুল সহই মেঘদূতকে মেনে নিতে হবে। মেনে নেবো, সম্মান করবো ধর্মগ্রন্থকে কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন থাকবো। সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে ধর্মের বহুবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব এবং মানুষ তার প্রয়োজনমত তা করেও থাকে। প্রমাণ : হিন্দু

শাস্ত্রের টীকা আর ইসলাম ধর্মের তাফসীর। বিজ্ঞানের মতোই ধর্ম ও ঈশ্বর ধারণার পরিমিত ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

কেমন হতে পারে সেই পরিমিত ব্যবহার? মনে করুন, আপনার মায়ের পুরোনো কাপড়ের বাক্স খুঁজে আপনি আপনার ছোটবেলার একটি জামা খুঁজে পেলেন। যে কোন কারণে বা প্রয়োজনে এই জামাটি আপনি ব্যবহার করতে চান। কিন্তু অত ছোট জামা ব্যবহার করতে গেলে জামাটি ছিঁড়ে যাবে বা আপনার শরীর কেটে যাবে। এমতাবস্থায় কি করা যায়? জামাটির তিন ধরণের ব্যবহারের কথা ভাবা যেতে পারে : ১. ড্রয়িংরুমের এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখলেন জামাটিকে। জামাটি আপনার অতীত। আপনার ছেলেমেয়ে-বন্ধুবান্ধবেরা আপনার ছোটবেলার জামাটি দেখে চমৎকৃত হলো; ২. জামাটির সাথে নূতন কাপড় জোড়া দিয়ে বড়সড় করে নিয়ে জামাটি আবার ব্যবহার করা শুরু করলেন; ৩. নিজেকেই কেটেকুটে জামার মাপে ছোট করে নিলেন। তাতে আপনি নিজে মরলেও জামাটিতো বাঁচলো!

পাশ্চাত্যে সুন্দর সুন্দর সব গীর্জা। বছর বছর এগুলো সংস্কার করা হয়। পাশ্চাত্যের মানুষ এসব ধর্মস্থানের ভিতরে খুব একটা ঢুকে না কিন্তু দূর থেকে নিজেদের সুন্দর অতীত দেখে আনন্দ পায়। মৌলবাদীরা হাজার বছর আগের ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে মানতে গিয়ে মানুষকে কেটে ছোট করতে চায়। এতে মানুষ মরে যায়। মানুষ মরে গেলে ধর্মও বাঁচে না। অথবা যা বাঁচে তা ধর্ম নয়, অধর্ম। ধর্মের মূল নিয়মগুলো এতই সার্বজনীন যে এগুলো যে কোন যুগে যে কোন মানুষের জীবনের সাথে কমবেশী মিলে যেতে পারে। বুদ্ধিমান মধ্যপন্থীরা ধর্মের কম গুরুত্বপূর্ণ ও যুগ-অনুপযোগী নিয়মগুলোকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলতে জানে, অর্থাৎ আঠা বাঁচিয়ে শুধু কাঁঠালের রসটুকু খেতে জানে তারা। এতে ধর্ম আর মানুষ উভয়েরই মঙ্গল হয়।

ভলতেয়ারকে এক বার নাকি জিগ্যেস করা হয়েছিল : মন্ত্র দিয়ে আদৌ ভেড়া মারা যায় কি না। তিনি জবাব দিয়েছিলেন : অবশ্যই যায় তবে তার আগে একটু সেঁকো বিষ খাইয়ে দিলে ভালো হয়। ধর্ম আর ঈশ্বর ছাড়া যে সমাজ চলে না তা নয় তবে এ দু'টি ধারণা থাকলে ভালো হয়। ঈশ্বর ও ধর্মের প্রধান সুবিধা হছে এই যে মানুষের মনে এই ধারণা দু'টি থাকার ফলে সে কমবেশী পাপ থেকে বিরত হয়। সব সমাজেই কিছু কিছু বকধার্মিক লোক ধর্ম ও ঈশ্বর উভয়কে কলা দেখায় - এটা ঠিক, কিন্তু সমাজের বেশীর ভাগ মানুষই হরহামেশা পাপ করেন না, কারণ তাদের মধ্যে পাপ-পূণ্যের এক ধরণের বোধ কাজ করে। সাধারণ মানুষের মনে এই বোধের উৎস ঈশ্বর ও ধর্ম। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেবার জন্য ঈশ্বরজাতীয় কেউ যদি না থাকেন, এবং কোনটা পাপ আর কোনটা পূন্য তা র্নিধারণ করার জন্য যদি ধর্ম না থাকে তবে আমজনতার মনে পাপ-পূন্যবোধের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। কোন একদিন নূতন কোন ধারণা দিয়ে ঈশ্বর ও ধর্মকে প্রতিস্থাপিত করা গেলে এ দু'টি ধারণার গুরুত্ব নিজে থেকেই কমে যাবে কিন্তু যতদিন তা না করা যাছে ততদিন এ ধারণা দু'টির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয়।

আজকের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপীয় নবজাগরণের কিছু আগে পরে। এর আগে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে সমাজবদ্ধ করা, মানুষের আদিম মনকে আজকের আধুনিকতার জন্য ধীরে ধীরে তৈরী করার ক্ষেত্রে ধর্ম ও ইশ্বর প্রধান দু'টি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ধর্ম ও ঈশ্বরের ভয়ে এখনও অন্ততঃ কিছু মানুষ সৎ থাকে, সত্যবাদী হয়, পাপ করলে অনুতাপ করে। কিন্তু আগেই বলেছি,

সব ভবী ভোলে না। সুতরাং যে কোন সমাজে অন্যায়-অবিচার থাকে। যাবতীয় অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্যে একজন ন্যায়পাল প্রয়োজন। ঈশ্বর সমাজমানসের সেই ন্যায়পাল।

উপরে উল্লেখিত টুকরো টুকরো এই সব ধারণা মিলিয়ে তৈরী হয়েছে মানুষের সমাজদর্শনের পাজল্ বা মোজাইক। রোমান স্থাপত্যে কোন ইমারতের খিলান (আর্চ) বা গম্বুজের পুরো কাঠামোটি একটি মাত্র পাথরের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। একে বলা হয় 'কী-স্টোন' বা ফরাসীতে 'ক্লে দ্য ভূউত'। এই পাথরটি খুলে নিয়ে পুরো খিলান বা গম্বুজটি ভেঙে পড়ে। ঈশ্বর সমাজ-গম্বুজের এই কী-স্টোন। কোন একক ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া চলতে পারে। কিন্তু পুরো সমাজের পক্ষে সবসময় তা সম্ভব হয় না। কোন না কোন ফর্মে ঈশ্বর বাস করতে থাকেন সমাজ ও ব্যক্তিমানসে। আর ঈশ্বর যদি পুরোপুরি নির্বাসিত না হন তবে কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো, ধর্মও জড়িয়ে থাকে মানুষের মননে, সমাজ ও জীবনে।

নিজের আদলে ঈশ্বরকে কল্পনা করার কাজটি মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে করে আসছে, আরও বহুকাল করবে। জানি না, ঈশ্বর ও ধর্মবিহীন সমাজ কোনদিন গঠন করা সম্ভব হবে কিনা। আমি মনে করি, সম্ভব নয়। কোন না কোন ফর্মে এই দু'টি ধারণা ফিরে ফিরে আসবে। এতে আমি ক্ষতির কোন কারণ দেখি না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ঈশ্বর ধারণাকে বাতিল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সে চেষ্টা সফল হয়নি। সমাজতন্ত্রে অবশ্য এক ধরণের ভন্ডামীও ছিল। ঈশ্বরকে নিষিদ্ধ করে সেখানে লেলিনের শবপূজা, মার্ক্স-মাওয়ের মূর্তিপূজা চালু করা হয়েছিল। আমি মনে করি, জোর করে বা আইন জারি করে কোন ধারণাকে বাতিল করার চেষ্টা না করাই ভালো। সমাজমানসিক গঠনের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে যদি কোন ধারণা ধীরে ধীরে নিজে নিজেই অপসৃত হয় তবে সেটাই শ্রেয়তর।

এত সব কথা বলার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইছি না। ক্ষমা না চাওয়ারও তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ আমার এ লেখাটিতে ঈশ্বরকে মানুষের কল্পনার বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। 'হিউম্যান' বা 'মানুষালী' গন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর এখানে আরও বেশী ঐশ্বরিক হয়ে উঠেছেন ('ঐশ্বরিয়া'ও বলতে পারেন কারণ ঐশ্বরিয়া একেবারেই স্যাল-ম্যান পছন্দ করে না!)। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন তবে তাঁর ইছা ছাড়া এ লেখাটি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। এ ঈশ্বরেরই লেখা (যেহেতু আমি আমার দুই দাদুরই উত্তরাধিকার!)। তৃতীয়তঃ 'ক্ষমা চাওয়া' একটি মানবিক গুন। ক্ষমা আমি চাইতেই পারি যেহেতু আমি মানুষ। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমা করা বা না করার প্রশ্নই ওঠে না কারণ, ঈশ্বর আর যাই হোন, আগেই বলেছি, আবারও বলছি, মানুষ তিনি নন।